শেখ হাসিনা সেদিন সীমান্ত খুলে না দিলে কী হতো!

২০১৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বরে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দেখতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেইদিনের তার চোখে মুখে ছিলো এক অন্যরকম মায়া। ভাষাগত দুরত্বের পরেও মানুষকে কীভাবে কাছে টেনে নিতে হয় সেইদিন তা দেখিয়েছিলেন মানবিক প্রধানমন্ত্রী ও মমতাময়ী শেখ হাসিনা। গত ছয় বছর ধরে তার সরকার যেভাবে লক্ষ লক্ষ নারী শিশু রোহিঙ্গাকে আগলে রেখেছেন, বারবার একটা প্রশ্ন সামনে আসে- কী হতো সেদিন, যদি বাংলাদেশের সীমান্ত খুলে দেওয়া না হতো।

রোহিঙ্গা নারীর বয়ানে শোনা যায়- চারপাশে ধোয়া। গুলি। একের পর এক গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যে যেভাবে পেরেছি, পালিয়ে এসেছি। আমরা নিঃস্ব।

এই মানুষগুলো তখন এমন আস্থা খুঁজছিলেন, যারা তাদের আবারও তাড়িয়ে দিবে না। রোহিঙ্গাদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমদিন কী বলেছিলেন শেখ হাসিনা? উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের থাকার ব্যবস্থা তখনও পুরোপুরি হয়নি। তিনি বলেন, ‘স্বজন হারানোর বেদনা আমি বুঝি৷ ঘরবাড়ি হারিয়ে যেসব রোহিঙ্গা এখানে এসেছেন, তারা সাময়িক আশ্রয় পাবেন৷ আপনারা যাতে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারেন, সে ব্যাপারে চেষ্টা চলছে”

একজন রিফিউজির দুঃখ-কষ্ট তিনি বোঝেন। কারণ, ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তিনি এবং তার ছোটবোন শেখ রেহানা রিফিউজি হিসেবে ছয় বছর বিদেশে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী পৃথিবীর অন্যতম অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত একটি জাতিসত্তার নাম। রোহিঙ্গাদের ওপর জাতিগত নিধন কোনো নতুন বিষয় নয়। বিগত চার দশকের বেশি সময় বিষয়টি সাময়িক মনে করা হলেও এখন তা স্থায়ী সমস্যা হিসেবে বিরাট আকার ধারণ করেছে। সেটা বিশ্বনেতৃত্বের অজানা নয়।

২০১৭ সালের আগস্টে মিয়ানমারের রাখাইনে তথাকথিত আরসা নাটকের মাধ্যমে রোহিঙ্গানিধন শুরু হলে পরবর্তী কয়েক মাসে দফায় দফায় সাড়ে সাত লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশের মতো বাংলাদেশ তখন সাগরে ভাসমান

রোহিঙ্গা জাহাজকে ফের সাগরে ঠেলে দিতে পারেনি। অনেকে বলতে চেষ্টা করেছেন, এতো মানুষকে আশ্রয় দিয়ে বোকামি করেছে বাংলাদেশ। বলতে চেষ্টা করেছে এতে করে সার্বভৌমত্ব খর্ব হতে পারে। জঙ্গি উত্থানের শঙ্কার কথাও বলেন কেউ কেউ। কিন্তু একবারও ভেবে দেখেছি সেইদিন যদি সীমান্ত খুলে দেওয়ার নির্দেশ শেখ হাসিনা না বলতেন তবে কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হতো। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিল শেখ হাসিনার সরকার। এছাড়া গত ৫০ বছরে আরও তিন দফায় প্রায় চার লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে ঢুকেছে। সবমিলিয়ে বাংলাদেশে এখন সাড়ে ১১ লাখ রোহিঙ্গা অবস্থান করছে। প্রতিবারই সহিংসতা এড়াতে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে ঢুকলেও এসব সহিংসতা ও নিপীড়নের অভিযোগ সবসময়ই অস্বীকার করে গেছে মিয়ানমার সরকার।

শেখ হাসিনা সেদিন এতো মানুষের জায়গা করে দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু ভাবেননি পরবর্তীতে কী হবে। সেসময়ে করণীয় কী সেটাই ছিলো মূখ্য। তিনি কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন করে বলেছিলেন, এ দেশের ১৬ কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারলে কয়েক লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয়া ও খাওয়ানো কোনো কঠিন কাজ নয়। নেদারল্যান্ডসের নামকরা ডিপ্লোম্যাট ম্যাগাজিন সাময়িকী তাদের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের শিরোনাম করেছিল ‘শেখ হাসিনা: মাদার অব হিউম্যানিটি’। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের আশ্রয় দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সীমান্ত খুলে দেয়ার সিন্ধান্ত নিয়ে লাখ লাখ নির্যাতিত মানুষের জীবন রক্ষা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা সংকট নিরসনসহ স্থায়ী সমাধানে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে পাঁচ দফা এবং ৭৪তম অধিবেশনে চার দফা প্রস্তাবও রেখেছিলেন।

ক্যাম্পের আশ্রয় ব্যবস্থাপনা দেখতে এ দেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতরাও সেখানে গিয়েছিলেন। শেখ হাসিনা মিয়ানমারকে ওই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ ও তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে চাপ দেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সাময়িক সময়ের জন্য আশ্রয় দিচ্ছি আমরা। নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের জন্য এখানে সাময়িকভাবে থাকা-খাওয়া, চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করা হবে। আমরা আছি আর্তমানবতার সেবায়।’

সেই রাতে তাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসা সরকার প্রধান তার কর্তব্য মনে

করেছিলেন। কিন্তু এই বিশ্ব কি তার দায়িত্ব পালন করেছে ঠিকঠাক? এরপর পার হয়ে গেছে ছয় বছর। রোহিঙ্গাদের ভালো থাকা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের যতো মাথা ব্যাথা, বিশ্বমোড়লদের সেই আন্তরিকতা দৃশ্যমান নয়। ২০১৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে রয়টার্সকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী জানান, বাংলাদেশ ধনী দেশ নয়। কিন্তু যদি আমরা ১৬ কোটি জনগণকে খাওয়াতে পারি, তবে আরও ৭ লাখ মানুষকেও খাওয়াতে পারব। আসলেই তিনি তার কথা রেখেছেন। গত ছয় বছর থেকে ১১ লাখ রোহিঙ্গার ভরণপোষণের দায়িত্ব এভাবেই পালন করে যাচ্ছেন তিনি।

রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়্যিপ এর্দোয়ান৷ জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর-এর বিশেষ দূত ও হলিউড তারকা অ্যাঞ্জেলিনা জোলি রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ও সহৃদয় নেতৃত্বদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেন। দেশে বিদেশে সকল মানবিক সরকার ও বিশিষ্টজন শেখ হাসিনার এ উদ্যোগকে এক কথায় সমর্থন যুগিয়েছে। মানবতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয়ায় সংবাদ সংস্থা ইন্টার প্রেস সার্ভিস থেকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর আগে জাতিসংঘের সাবেক দুই মহাসচিব কফি আনান ও বুট্রোস ঘালি এবং ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট মার্তি আহতিসারি এই সম্মাননা পেয়েছেন।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (ডব্লিউএফপি) ১ মার্চ থেকে রোহিঙ্গাদের জন্য খাদ্যসহায়তা কমিয়ে মাথাপিছু মাসিক বরাদ্দ ১২ ডলার থেকে ১০ ডলার করেছে। পরবর্তীতে ১ জুন থেকে তা ১০ ডলার থেকে কমিয়ে ৮ ডলার করেছে যা হতাশাজনক। রোহিঙ্গারা সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল। এর ফলে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে খাদ্য সংকট বাড়বে এবং ক্যাম্পের নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে ত্রানকর্মীরা। এদিকে, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে এখন চীনের উদ্যোগে মিয়ানমারের নেয়া পাইলট প্রকল্প, পশ্চিমা দেশ ও দাতা সংস্থার সহায়তা হ্রাস, রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আত্তিকরন, রোহিঙ্গা নারী ও স্বেচ্ছায় রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ, কিছু রোহিঙ্গার প্রত্যাবাসনে অনীহা সব মিলিয়ে নানামুখী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলছে। পরিস্থিতি যাই হোক, বাস্তবতা হলো, রোহিঙ্গাদেরকে মিয়ানমারে ফিরে যেতে হবে এবং দাতাগুষ্টিকে এই সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত মানবিক হতে হবে। দ্রুত এই সমস্যা

সমাধানে বিশ্ব মানবতাকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে মানবিকতা দেখিয়েছেন সেটাকে সম্মান দেখানোর পাশাপাশি এটি বিবেচনায় নিতে হবে যে এই সমস্যা থেকে বের করে আনা বাংলাদেশের একার দায়িত্ব না।
লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

চুয়াডাঙ্গার বেনীপুর গ্রামের মিজানুরের লাশ আট দিন পর ফেরত দিল বিএসএফ

অবৈধভাবে সীমানা অতিক্রম করে ভারতের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের পর চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজলার সীমান্ত ইউনিয়নের বেনীপুর গ্রামের নিখোঁজ মিজানুর রহমানের (৫০) লাশ আট দিন পর বিজিবির কাছ ফিরিয় দিলো ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

আজ বুধবার বিকাল ৫টার পর বাংলাদশ-ভারত সীমান্তের নোনাগঞ্জ শুন্য রেখায় লাশ নিয়ে আসা হলে নিহতের স্ত্রী নাসিমা খাতুনের সনাক্তর পর এদিন সন্ধ্যা ৬টা ২৩ মিনিটে হস্তান্তর করা হয়।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ এস.এম.জাবীদ হাসান জানান, বিএসএফর গুলিত নিহত বাংলাদশী নাগরিক বেনীপুর গ্রামের ক্যাম্পপাড়ার মরহুম নছর উদ্দিনের জামাতা এবং ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার শেখপাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা নবিছদ্দীনের ছেল অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের অভ্যান্তরে অনুপ্রবশের পর নিখোঁজ হয়েছিলেন। তার পরিবারের দাবী গরু আনতে গিয়ে বিএসএফ সদস্যদের মুখামুখী হলে তারা তাকে গুলি করে হত্যা করে। নিহতের পারিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়,ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণগঞ্জ থানার নোনাগঞ্জ সীমান্তে ওই হত্যাকান্ডের ঘটনাটি ঘটে।

লাশ হস্তান্তের সময় উপস্তিত ছিলেন, সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইশাবুল ইসলাম মিল্টন জানান, মিজানুর রহমান কিছুদিন ধরে ভারতীয় গরু অবৈধভাবে আনা নেওয়ার সঙ্গে জড়িত ছিল। এছাড়াও তিনি

সাম্প্রতিক সময় অবৈধভাব মানুষ পারাপার করতো।

গত বুধবার (১৩ সেপ্টম্বর) রাত ৮টার দিকে তিনি নিজ এবং তার সহযোগী কয়েকজন অবৈধভাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণগঞ্জ থানার নোনাগঞ্জ সীমান্তেযান। সেখান থেকে ফেরার সময় বিএসএফ সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। এতে তিনি মারা যান।

লাশ হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহের মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত পরিচালক সাইফুল ইসলাম, বেনীপুর বিওপি কমান্ডার আতিয়ার রহমান,জীবননগর থানার এসআই এস.এম. রায়হান, এসআই সৈকত পাড়, জীবননগর উপজলা স্বাস্থ কমপ্লক্সের চিকিৎসক মোস্তাফিজুর রহমান। এ সময় ভারতের বিএসএফের উপস্থিতে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর থানা পুলিশ লাশটি নিহতের পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেন। এরপর আইনগত প্রক্রিয়া শেষ নিহত মিজানুরের লাশ দাফনের উদ্দেশ্য তার আত্মীয়-স্বজন এ্যাম্বুলন্সে করে ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার শেখপাড়ায় নিয়ে যান।

নির্বাচনকে সামনে রেখে ফের সক্রিয় হিযবুত তাহরীর

প্রতিবছরই তারা এই আয়োজন করলেও এবারের অনলাইন সম্মেলনের টাইমিং ও উদ্দেশ্য প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, নিষিদ্ধের এক যুগ পেরিয়ে গেলেও হিযবুত তাহরীরের দৃশ্যমান কর্মকাণ্ড নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। আর পুলিশ বলছে, প্রচারণা থাকলেও বড় নাশকতার সক্ষমতা নেই জঙ্গি সংগঠনটির।

ঢাকার বেশকিছু ব্যস্ততম এলাকায় নতুন করে প্রচারণায় নেমেছে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর। ডেকেছে অনলাইন সম্মেলনও। সেই সম্মেলনের প্রচারণার পোস্টারে সয়লাব রাজধানীর বিভিন্ন দেয়াল। রাজধানীর পল্টন, সিদ্ধেশ্বরী, বাংলামোটর, রামপুরা, কলাবাগান এলাকার দেয়াল ছেয়ে গেছে নিষিদ্ধ সাংগাঠনের পোস্টারে।

এলাকার লোকজন বলছেন, মঙ্গলবার মধ্যরাতের পর কোন একসময় পোস্টারগুলো লাগানো হয়েছে। তবে কারা কীভাবে লাগিয়েছে তা জানেন না স্থানীয়রা। তবে তাদের শঙ্কা, এভাবে ওরা সংগঠিত হয়ে বড় ধরনের কোন অপকর্ম ঘটানোর প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। একটি নিষিদ্ধ সংগঠন চোখের সামনে তাদের কার্যক্রম কীভাবে পরিচালনা করছে এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

এব্যাপারে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবীর বলেন, ‘আমি মনে করি না বিষয়টি শুধু পোস্টারিংয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পুলিশের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অন্য যে ইউনিটগুলো কাজ করছে, তাদের সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে পোস্টার লাগিয়ে যখন কেউ নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে। তাদেরকে খুব ক্যাজুয়ালি নেওয়ার কিছু নেই, তারা বিপদজনক।’

এদিকে পোস্টার লাগানোর ১২ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও কারা কোথা থেকে এসে পোস্টার সেঁটে দিয়ে গেলো সে নিয়ে কোন তথ্য নেই থানায়। কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘এখনও আমি বিষয়টি অবগত নই। আমি টহল টিম পাঠিয়ে এখনই খোঁজ নেওয়ার ব্যবস্থা করছি। যদি তারা কোনো ধরনের প্রচারণা চালিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঘটনা ঘটার পরে প্রতিক্রিয়া দেখানোর মধ্য দিয়ে সুরাহা করা যাবে না উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলাজি অ্যান্ড ক্রিমিনাল জাস্টিস বিভাগের অধ্যাপক জিয়া রহমান বলেন, ‘অপরাধ দমনের জন্য প্রঅ্যাকটিভ ও রিঅ্যাকটিভ দুটো পদ্ধতি থাকে। আমাদের এখানে প্রঅ্যাকটিভ উদ্যোগ দেখা যায় না। আমাদের যেনো দেখতে দেখতে সয়ে যাচ্ছে। বিষয়গুলো সিরিয়াসলি দেখা দরকার। দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা করে এগুলো থামানো দরকার। ভুলে গেলে চলবে না ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে।’

২০০৯ সালে সরকার হিযবুত তাহরীরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও বারবার তাদের উপস্থিতি জানান দিতে তৎপর এ জঙ্গি সংগঠনটি। কথিত খিলাফত প্রতিষ্ঠায় কখনও মিছিল আবার কখনও ভার্চুয়াল সম্মেলনের আয়োজন করলেও তা বন্ধ করা যাচ্ছে না। আর আয়োজকরা চিহ্নিত হলেও এখনো তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এসডিজি অর্জনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চাইবেন শেখ হাসিনা

জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারণ অধিবেশনের মূল পর্ব শুরু হয়েছে। টানা পনেরো বারের মতো এই সম্মেলনে যোগ দিতে নিউ ইয়র্কে আছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতিসংঘে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি মুহাম্মদ আব্দুল মুহিত আগেই সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস পুনর্গঠন এবং বিশ্বব্যাপী সংহতি পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ে এবারের অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে। বৈশ্বিক শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি এবং একটি টেকসই ভবিষ্যতের জন্য সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ২০৩০ এজেন্ডা এবং এর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন সংক্রান্ত আলোচনা এবারের অধিবেশনে বিশেষ প্রাধান্য পাবে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের নেতারা জানান, আগের যেকোনো বারের সফরের চেয়ে এ সফর অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ।

মুহিত আরও বলেন, বৈশ্বিক শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি এবং একটি টেকসই ভবিষ্যতের জন্য সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ২০৩০ এজেন্ডা এবং এর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন সংক্রান্ত আলোচনা এবারের অধিবেশনে বিশেষ প্রাধান্য পাবে। এছাড়া বাংলাদেশের অভাবনীয় উন্নয়ন অগ্রযাত্রা, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যখাতে সাফল্য ইত্যাদি বিষয় নিয়েও কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা, নিরাপদ অভিবাসন, বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক সংকট, জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বিষয়গুলোও উঠে আসবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারের অধিবেশনে বাংলাদেশের এসডিজি অর্জনের বিষয়টি জানাবেন বিশেষভাবে। পাশাপাশি এসব অর্জনের ধারবাহিকতা রক্ষায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কামনা করবেন। সারা বিশ্বের টেকসই উন্নয়নের জন্যে জাতিসংঘের উদ্যোগ ‘এসডিএসএন’ বাংলাদেশ অংশের গবেষণা অুনযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে দারিদ্র্য

বিলোপ, ক্ষুধা মুক্তি, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ, গুণগত শিক্ষাসহ ১৭টি লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা চলছে। এবার এ সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে: ‘আস্থা পুনর্গঠন ও বিশ্ব সংহতির পুনরুদ্ধার : সবার জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও স্থায়িত্ব ত্বরান্বিত করায় ২০৩০ এজেন্ডা এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ’।

এসডিএসএন’ এর গবেষণা বলছে, কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভালো করেছে বাংলাদেশ। ২০২৩ সালে ১৬৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০১তম। যেটি গতবছর ১৬৩টি দেশের মধ্যে ছিল ১০৪তম অবস্থানে। ২০১৭ সালে ১৫৭টি দেশের মধ্যে অবস্থান ছিল ১২০তম। ২০২০ সালে বৈশ্বিক র্যাংকিং ছিল ১৬৬টি দেশের মধ্যে ১০৯তম। এসডিজিতে বাংলাদেশের কান্ট্রি স্কোর ৬৫.৯।

‘এসডিএসএন’- এর ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গুণগত শিক্ষা এবং পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জনে সঠিক পথে আছে বাংলাদেশ। দারিদ্র্য বিলোপের ক্ষেত্রে পরিমিত রূপে উন্নতি করেছে বাংলাদেশ। ক্ষুধা মুক্তির ক্ষেত্রে অপুষ্টি হ্রাসে ২০২০ সাল পর্যন্ত অগ্রগতির হার ১১.৪, যা এসডিজি লক্ষ্য অর্জনের পথেই রয়েছে। প্রতি হেক্টরে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ২০২১ সাল পর্যন্ত অগ্রগতির হার ৫.০, এটিও এসডিজি লক্ষ্য অর্জনের পথে রয়েছে।

সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ শিরোনামে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে মায়ের মৃত্যুহার কমানোর ক্ষেত্রে ২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ খুবই ভালো করেছে। নবজাতকের মৃত্যুহার হ্রাস এবং ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার হ্রাসের ক্ষেত্রেও ২০২১ সাল পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জন বেশ সন্তোষজনক। এইডস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেও বাংলাদেশ সফল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশে টিকাপ্রাপ্ত শিশুদের সুস্থ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের সাফল্যের হার ৯৭, যা এসডিআর রিপোর্ট অনুযায়ী সন্তোষজনক। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত লক্ষ্যে সুপেয় পানি পান ও ব্যবহার নিশ্চিতে ২০২০ সালের তথ্যমতে বাংলাদেশ এসডিজি লক্ষ্য অর্জন করেছে এবং এই সাফল্য ধরে রাখার চেষ্টা করছে।

সপ্তম টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন অর্থাৎ সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানিতে ২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বড় সাফল্য জনগণের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছানো। জ্বালানি থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণেও ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জন সন্তোষজনক ।

শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামোর লক্ষ্য অর্জনে সামগ্রিকভাবে পরিমিত রূপে উন্নতি করেছে বাংলাদেশ। মোবাইল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারে ২০২১ সালের হিসাব অনুযায়ী এসডিজি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বাণিজ্যিক এবং যোগাযোগব্যবস্থা সম্পর্কিত অবকাঠামো নির্মাণেও ২০১৮ সালের তথ্যমতে বাংলাদেশ একইরকম সাফল্য দেখাতে পেরেছে।

মুহাম্মদ আব্দুল মুহিত বলেন, এবারের অধিবেশনে বাংলাদেশের জন্য রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তন এক নম্বর প্রায়োরিটি ইস্যু। এই বক্তব্য আবারও বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিতে একটি সাইড ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি ১১টি উচ্চ পর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জাতিসংঘ মহাসচিব এবং বেশ কয়েকটি দেশ ও সংস্থার প্রধানরা দ্বিপাক্ষিক সভা করবেন। সবখানেই প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের এসডিজি অর্জনের সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে সবার সহায়তা চাইবেন।

এবার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ১৫০ রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন শেখ হাসিনা। এরই মধ্যে মূল বিতর্ক পর্ব শুরু হয়েছে । অধিবেশন চলবে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রতিবছরের মতো এবারও মূল অধিবেশনে শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর) শেখ হাসিনা বাংলায় ভাষণ দেবেন।

কেন ইইউ এর রেজুলেশন পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে?

২০২৪ সালে অবাধ ও সুষ্ঠু সংসদ নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ সরকার যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই সম্পর্কিত একটি প্রস্তাবের উপর ইউরোপীয় পার্লামেন্টে (ইইউ) আলোচনা হয়েছে যা বিভিন্ন মহলে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। একই সাথে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং বাংলাদেশ সরকারকে মানবাধিকার সংস্থা-অধিকারের বিরুদ্ধে সমস্ত আইনি মামলা প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছে। বিশেষ করে এই সংগঠনের প্রধানের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক দণ্ডের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই ধরণের আলোচনা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সীমানা পেরিয়ে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্নের উদ্রেগ করেছে। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য প্রশংসনীয় প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তবে একটি স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের জন্য এই ধরনের একটি রেজোলিউশন সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায় কিনা তা মূল্যায়ন করা অপরিহার্য।
এটা স্বীকার করা অপরিহার্য যে কোনো গণতান্ত্রিক সমাজে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলি তাদের কাজের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই সংস্থাগুলি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নজরদারি করতে পারে। যাইহোক, বাংলাদেশে মানবাধিকার সংস্থা-অধিকার এর মামলাটি ২০১৩ সালের হেফাজতে ইসলামীর সমাবেশে মৃত্যুর সংখ্যা সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রচারের অভিযোগকে ঘিরে। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলিসহ যে কোনও সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা তাদের দেওয়া তথ্যের নির্ভুলতার উপর নির্ভর করে। যদি এটি প্রমাণিত হয় যে অধিকার মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করেছে, তাহলে এটি নৈতিক ও আইনগত উদ্বেগ বাড়ায়।
অনেক মিডিয়া হাউস সেই সময় অধিকারের দাবির বিষয়ে স্বাধীন অনুসন্ধান চালিয়ে তাদের প্রকাশিত তালিকায় অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছিল। মৃত হিসাবে তালিকাভুক্ত অসংখ্য ব্যক্তিকে জীবিত পাওয়া গেছে তাদের অনুসন্ধানে। ফলে এই ধরণের কার্যক্রম মানবাধিকার সংস্থাগুলির দ্বারা প্রচারিত তথ্যের যথার্থতা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পাশাপাশি যে কোনও সম্ভাব্য অসদাচরণ মোকাবিলার জন্য একটি ন্যায্য এবং স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। সেই সময়ে অধিকারের মাধ্যমে মিথ্যা তথ্যের বিস্তার শুধু সরকারের সুনামই নষ্ট করেনি বরং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে অসন্তোষের অনুভূতির জন্ম দিয়েছিল।
তাই, অধিকারের বিরুদ্ধে আইনি মামলা প্রত্যাহারের জন্য ইইউ পার্লামেন্টের আবেদনকে বাংলাদেশের আইনের শাসনকে সম্মান করার প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করা এবং আইনি ব্যবস্থার পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্তকে সম্মান করার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য। যদি অধিকারের পদক্ষেপগুলি বাংলাদেশের আইন লঙ্ঘন বলে মনে করা হয়, তাহলে সরকারের আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার রয়েছে। ইইউ পার্লামেন্ট ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের নীতিগুলিকে সমুন্নত রেখে স্বচ্ছ ও ন্যায্যভাবে আইনি কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন করতেই পারে। তবে, আইনি অভিযোগ খারিজ করার অনুরোধ করা যুক্তিযুক্ত নয়।
অধিকারের মামলাটির মাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মানবাধিকার সংস্থার জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসনের মধ্যে জটিল সমীকরণের বিষয়টিকে তুলে ধরেছে। ফলে, তারা যেমন প্রত্যাশা করতে পারে যে

একটি আইনি পদক্ষেপ ন্যায্যতা ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চলবে, ঠিক তেমনি ভাবে ইইউ পার্লামেন্টের বাংলাদেশ সম্পর্কিত যে কোন ধরণের রেজুলেশন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং এর আইনি ব্যবস্থার প্রতি সম্মান জানানোর মাধ্যমে নেওয়া উচিত। তাই, একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে সম্মান জানিয়ে ইইউকে কেন আরও গঠনমূলক পন্থা অবলম্বন করা উচিত সেই বিষয়টি এই নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।
বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র যার নিজস্ব সরকার, সংবিধান এবং আইনি কাঠামো রয়েছে। একটি সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপকে তার সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ইইউ-এর জন্য আন্তর্জাতিক আইনের নীতি এবং জাতির সার্বভৌমত্বকে সম্মান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে গঠনমূলক সম্পৃক্ততা এই উদ্বেগগুলি মোকাবিলায় আরও উপযুক্ত উপায় হতে পারে।
সংঘাতপূর্ণ হিসাবে দেখা যেতে পারে এমন রেজুলেশন জারি করার পরিবর্তে, ইইউকে বাংলাদেশ সরকারের সাথে সংলাপ এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। দ্বিপাক্ষিক আলোচনাকে উৎসাহিত করা মানবাধিকার সমস্যা সমাধানের জন্য আরও ইতিবাচক ও সহযোগিতামূলক পদ্ধতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। এ ধরনের সংলাপ ইইউকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের জটিলতাকে আরও ভালোভাবে বোঝার সুযোগ করে দিতে পারে।
ইইউ বাংলাদেশের সুশীল সমাজের সংগঠনগুলিকে তাদের সমর্থন চালিয়ে যেতে পারে। মানবাধিকার রক্ষার জন্য এই সংস্থাগুলির প্রচেষ্টা দেশের মানবাধিকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফলে, সুশীল সমাজকে তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সম্পদ, প্রশিক্ষণ এবং প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করা ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে। তবে, তারা যদি কোন ভুল কাজ করে তবে তাদের সাথে যুক্ত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া ঠিক নয়।
বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক অনুঘটক। ইইউ-এর যে কোনো একতরফা পদক্ষেপের জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপড়েন আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই অঞ্চলের সকল রাষ্ট্রের সাথে ভাল কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা এবং আঞ্চলিক সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য কাজ করা ইইউ এর দায়িত্ব।
সুতরাং, ইইউ উচিৎ তাদের পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করার মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে আরো গঠনমূলক এবং কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করে মানবাধিকার বিষয়ক কোন সমস্যা থাকলে তার সমাধানের বিষয়ে সরকারের সাথে আলোচনা করা। অন্যথায়, এ ধরনের উদ্যোগকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অযাচিত অনুপ্রবেশ হিসেবে দেখা হতে পারে। ইইউ এর উচিত কূটনৈতিক চ্যানেলে বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্মানজনক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে

সমাধানগুলি খুঁজে বের করা। একতরফা সিদ্ধান্ত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষতি করতে পারে এবং দেশের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।
মানবাধিকারের পক্ষে ওকালতি করা এবং একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের মধ্যে পার্থক্যে বিষয়টি সম্পর্কে সকল পক্ষকে সচেতন থাকতে হবে। তাছাড়া, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা চ্যালেঞ্জিং হবে। যাইহোক, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির উচিত তাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে সতর্ক হওয়া। তাদের উচিত কোন দেশের মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার সময় সেই দেশের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করা।
লেখক: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের প্রফেসর।

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ঝুঁকি কম: ইআইইউ’র তথ্য

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ঝুঁকি কম বলে জানিয়েছে লন্ডন ভিত্তিক ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ)। সংস্থাটি বলছে, দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দুর্বল অবস্থানে আছে।

সম্প্রতি ইআইইউ এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, এশিয়ায় আর্থিক ঝুঁকি কমে এলেও পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা এখনো উচ্চঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তবে সে তুলনায় কম ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ।

’নো রিটার্ন টু চিপ মানি’ শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক সুদহারের সাম্প্রতিক ঊর্ধ্বগতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওপর চাপ বাড়িয়েছে। এর ফলে ২০২২ সালে ছয়টি দেশ ঋণখেলাপি হয়েছে। চলমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরও কিছু দেশ ঋণখেলাপি হতে পারে। এর পেছনে অন্যতম কারণ উচ্চ সুদহার।

বাংলাদেশ নিয়ে পূর্বাভাসে প্রতিষ্ঠানটি বলছে, বহির্বিশ্বের অর্থায়নের শর্ত পূরণ করতে গিয়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৬০ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। এর পাশাপাশি ২০২৩-২৪

অর্থবছরে রাজস্ব ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের বেশি হতে পারে।

তবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী দেশের বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ দশমিক ১ শতাংশের বেশি হবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপি অনুপাতে দেশের সরকারি ঋণ কিছুটা পরিমিত হতে পারে, যা হবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪০ শতাংশের কম। এ অর্থবছরে জিডিপি অনুপাতে বৈদেশিক মুদ্রায় সরকারি ঋণ হবে ১০ থেকে ৩০ শতাংশ।

প্রতিবেদনে পণ্য রপ্তানি, প্রাথমিক আয় ও রেমিট্যান্সের শতাংশ হিসাবে মোট বৈদেশিক ঋণ পরিষেবা ১০ শতাংশের কম হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। এতে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি ধরা হয়েছে ৬ শতাংশের বেশি।

এর আগে ইআইইউয়ের আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ ২০টি অর্থনীতির একটি হবে। এই তালিকায় বাংলাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ইন্দোনেশিয়াও স্থান পাবে। ফলে চীনের বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশ আকর্ষণীয় গন্তব্য হতে পারে।

তাতে বলা হয়, বাংলাদেশের বাজারের আকার ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে এই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ইলেকট্রনিক ভোগ্য পণ্য, তথ্য-প্রযুক্তি সেবা, টেলিযোগাযোগ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও গাড়ির কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বিনিয়োগের গন্তব্য হিসেবে কোন দেশগুলো চীনের বিনিয়োগকারীদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হতে পারে, তাদের নিয়ে একটি র্যাংকিং করেছে ইআইইউ। সেই র্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বাদশ। এক দশক আগে ২০১৩ সালেও এমন একটি র্যাংকিং করা হয়েছিল, যেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৫২তম। অর্থাৎ গত এক দশকে চীনের বিনিয়োগকারীদের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। ১০ বছরে ৫২তম স্থান থেকে ১২তম স্থানে উঠে আসা এর প্রমাণ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘বিএনপি-জামায়াতের পাঁচ বছর এবং সামরিক সরকারের পরবর্তী বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ মন্দার কবলে পড়েছিল। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির পাঁচটি দেশের মধ্যে একটি৷ ’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘২০০৯ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর আমরা দেশকে সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাই। আমরা স্বল্প, মধ্যম এবং

দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে দেশ গঠনের কাজে মনোনিবেশ করি। গণতান্ত্রিক পরিবেশ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সরকারের ধারাবাহিকতা এবং পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচি দ্রুত বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন বিশ্বের বর্ধনশীল পাঁচটি অর্থনীতির একটি। জিডিপিতে আমরা বিশ্বের ৩৫তম, ২০৩৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ২০তম জিডিপির দেশ হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে আমরা আশা রাখি।

দর্শনা সীমান্তে বিজিবির মহা পরিচালক সাথে বিএসএফের সৌজন্য বৈঠক ও মতবিনিময়

দর্শনা সীমান্ত বিজিবি-বিএসএফের সৌজন্য পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠক শেষে বিজিবি কর্মকর্তার সাথে মতবিনিময় করেছে (বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড) বিজিবির মহা পরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হোসাইন।

গতকাল রোববার ১৭ সেষ্টম্বর দুপুরে দর্শনা আইসিপি সীমান্তে পতাকা বৈঠক ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এই মত বিনিময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেঃ কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান জানান, গতকাল রোববার দুপুর ২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্ত চেকপোস্ট পরিদর্শন এসে পৌঁছান (বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড) বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হোসাইন। এ সময় চেকপোস্ট বিজিবি সম্মেলন কেন্দ্রে বিজিবির অভ্যর্থনা ও সালাম গ্রহন করেন। চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তের ৭৬ পিলারের বিপরিতে ভারতীয় অংশে বিজিবি-বিএসএফের সাথে সৌজন্য বৈঠক শুভেচ্ছা ও মত বিনিময় করেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় বিএসএফের কলকাতা বিএসএফের ভারপ্রাপ্ত আইজি ডিআইজি অমরেশ কুমার আরিয়া, সীমানগর ৩২ ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট সুজিত কুমার সহ বিএসএফের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা।

বিজিবির পক্ষে আরো উপস্থিত ছিলেন (বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড) বিজিবির পরিচালক প্রশাসন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খাইরুল কবির, যশোর বিজিবির রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহমেদ, কুষ্টিয়া বিজিবি সেক্টর কমান্ডার কর্নেল এমারত হোসেন, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেঃ কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, মহেষপুর -৫৮ ব্যাটালিয়ন বিজিবি ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর রাকিবুল ইসলাম , কুষ্টিয়া সেক্টরের জিটু মেজর মেহেদী হাসান, মেজর সেলিম, কুষ্টিয়া ৪৭ ব্যাটালিয়ন উপ-অধিনায়ক মেজর রফিকুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের সরকারি পরিচালক হায়দার আলী, মহেশপুর ৫৮ ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক সাইফুল প্রমুখ।

বৈঠকে দু দেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। উভয় বাহিনীর মধ্যে মিষ্টি ও উপহার বিনিময় করা হয়। বৈঠক শেষে বিজিবি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় শেষে বিকাল সাড়ে ৩ টায় দর্শনা ত্যাগ করেন।

জীবননগর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত হওয়ার অভিযোগ

জীবননগরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিএসএফের গুলিতে মিজানুর রহমান (৫০) নামে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছে বলে নিহতের পরিবার অভিযোগ করেছে।

নিহতের পরিবার সুত্রে যানা যায়, নিহত মিজানুর রহমান ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার শেখপাড়া গ্রামের নবী ছদ্দিনের ছেলে তিনি জীবননগরের সীমান্ত ইউনিয়নের বেনীপুর গ্রামের আয়ুব আলীর জামাতা। বিয়ের পর তিনি শ্বশুর বাড়িতে ঘরজামাই হিসেবে থাকতেন।

সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইশাবুল ইসলাম মিল্টন জানান, মিজানুর রহমান কিছুদিন ধরে ভারতীয় গরুর ব্যবসা করত। সাম্প্রতিক

সময়ে সে অবৈধভাবে মানুষ পারাপারের কাজ করে আসছিল। পরিবার সূত্রে আরও যানা যায়, গত বৃহস্পতিবার মিজানুর ও তার সহযোগীরা কয়েকজন মানুষ নিয়ে অবৈধভাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণগঞ্জ থানার নোনাগঞ্জ সীমান্তে যান।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস.এম. জাবীদ হাসান জানান, মিজানুর রহমানের স্ত্রী ইসনাহার থানায় এসে মৌখিকভাবে জানিয়েছেন তার স্বামীকে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি ৩ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন। গতকাল শনিবার দুপুরে মরদেহের একটি ছবি দেখে নিহত মিজানুরের স্ত্রী সনাক্ত করে এটা তার স্বামীর মৃত দেহ।

এ ঘটনার বিষয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবির মহেশপুর-৫৮ ব্যাটালিয়নের পরিচালক লেফটেনেন্ট কর্নেল মাসুদ পারভেজ রানা জানান, গতকাল শনিবার বেলা ১১ টার সময় এক মহিলা মৌখিকভাবে তার স্বামী মিজানুর তিনদিন ধরে নিখোঁজের বিষয়টি আমাদের কাছে জানিয়েছেন। আমরা ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের কাছে গতকাল শনিবার বিকালে পতাকা বৈঠকের চিঠি দিয়েছি পতাকা বৈঠকে জানতে পারবো মিজানুর নামে তারা কোনো বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে কি না? বিষয়টির সত্যতা বিএসএফ নিশ্চিত করলে আপনাদের জানানো হবে।

তৃতীয় বৃহত্তম বাজার হবে বাংলাদেশ! বিশ্বজুড়ে হৈচৈ

বাংলাদেশ হবে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বাজার! জার্মানি ও যুক্তরাজ্যের পরেই জায়গা হবে লাল-সবুজের বাংলাদেশ। এই কথাটি বলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু কিসের জোরে? ১৭ কোটি জনসংখ্যার এই দেশ কোন ম্যাজিকে রাতারাতি বিশ্বের নজর কাড়বে? উত্তর রয়েছে শেখ হাসিনার কথায়। নদী ঘেরা আজকের বাংলাদেশ সাজছে উন্নত স্মার্ট রূপে। তাই আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশকে নিয়ে একটু বেশি হৈচৈ হচ্ছে।

দক্ষিণ এশিয়ার ছোট্ট দেশ হলেও, প্রাকৃতিক সম্পদে ঠাসা বাংলাদেশ। তাই তো এখানে বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্র নেতাদের আনাগোনা একটু

বেশি। তার উপর বঙ্গোপসাগরের গা ঘেঁষে থাকা ইন্দোপ্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির অংশ হওয়ায় বিশ্ব ভূ রাজনীতিতে বাংলাদেশে কদর খানিকটা বেশি। এবার সেই দেশ হয়ে উঠবে বিশ্বের অন্যতম বাজার, কিন্তু কীভাবে?

বাংলাদেশের বাজারটা অনেকটা বড়। আর সেই বাজারকে গোটা বিশ্বের কাছে আকৃষ্ট করতে চাইছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। তাই তো কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলোকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দুই দিনব্যাপী কমনওয়েলথ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম ২০২৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেই এমন কথা বলেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান প্রায় ৩০০ কোটি মানুষের বাজারের কেন্দ্রস্থলে। এছাড়া, আমাদের রয়েছে ১৭ কোটি মানুষ। যার বৃহৎ অংশ যুবসমাজ। বাংলাদেশের সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রায় ৭০ শতাংশই আসে পুনঃবিনিয়োগ থেকে। এ থেকে প্রমাণ হয় বাংলাদেশে বিনিয়োগের চমৎকার পরিবেশ বিদ্যমান।’

ভৌগোলিক ভাবে বাংলাদেশ রয়েছে ৩০০ কোটি মানুষের বাজারের কেন্দ্রবিন্দুতে। বাংলাদেশেও প্রায় ১৭ কোটি মানুষের বসবাস। স্বাভাবিকভাবেই গোটা বিশ্বর কাছে বাংলাদেশ একটা আকর্ষণীয় বাজার। এই ব্যাপারটাকেই টার্গেট করতে চাইছেন শেখ হাসিনা। তাঁর কথায়, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে বিত্তশালী ব্যক্তির জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় সাড়ে তিন কোটিতে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ টক্কর দেবে জার্মানি এবং যুক্তরাজ্যকে। হয়ে উঠবে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম বাজার। তাই উন্নয়নে অবদান রাখতে আগ্রহী, এমন বিনিয়োগকারীর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তোলার অপেক্ষা করছেন তিনি।

এব্যাপারে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, ‘তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় এ দেশের অর্থনীতিকে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। আমার বিশ্বাস, সেই কিসিঞ্জার যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনিই এখন বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে বিস্মিত হতেন। এখন আমরা বাংলাদেশকে নিয়ে গর্ব করে বলতে পারি সেই তলাবিহীন ঝুড়ি আজ বিশ্বের বিস্ময়, উন্নয়নের এক

রোল মডেল।’

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা অর্থনীতিবিদ ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, ‘বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক দূর এগিয়েছে। স্বাধীনতার সময়ে অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে পাকিস্তান এগিয়েছিল। প্রতিটি সূচকেই তারা বাংলাদেশ থেকে পিছিয়ে আছে। এটিই আমাদের স্বাধীনতার বড় অর্জন।’

বাংলাদেশে এখন যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অগ্রগতি এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটা উচ্চমানের বিনিয়োগ প্রয়োজন। তাঁর কথায়, বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য এখন সব রকম খাতই খোলা। কৃষিপণ্য, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, চিকিৎসা সরঞ্জাম,অটোমোবাইল থেকে শুরু করে জাহাজ নির্মাণ ও আইসিটি খাতে দুর্দান্ত বিনিয়োগ করা যাবে। বিনিয়োগকারীরা লভ্যাংশ সহজ পদ্ধতিতে ফিরিয়ে নিতে পারবেন আপন দেশে।

আগ্রহ বাড়াতে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে তৈরি হয়েছে প্রায় ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল, ১০৯ টি হাইটেক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক সহ আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার। পাশাপাশি আধুনিক পরিকাঠামোতে সাজছে স্থল, রেল এবং বিমান যোগাযোগ। বাংলাদেশের অধিকাংশ মহাসড়কই চার কিংবা তার থেকেও বেশি লেনে উন্নীত করা হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ টি জেলাকে ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করেছে পদ্মা সেতু। খুব শিগগিরই সেতুর মাধ্যমে সূচনা হবে ঢাকা এবং খুলনার রেল যোগাযোগ। অপরদিকে প্রস্তুত কর্ণফুলী আন্ডারওয়াটার টানেল, এই ধরনের অবকাঠামো দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম। স্বপ্নের পর্যটন নাগরিক কক্সবাজারের সঙ্গে দ্রুত সংযুক্ত হবে চট্টগ্রামের রেল যোগাযোগ। আপাতত লক্ষ্য, ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞান ভিত্তিক এবং উন্নত স্মার্ট দেশে পরিণত করা। ২১০০ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ ব-দ্বীপ হয়ে উঠবে বাংলাদেশ। হাঁ হয়ে দেখবে পুরো বিশ্ব।

আদালতে আদিলুরের অপরাধ প্রমাণিত: ইউরোপীয় পার্লামেন্ট প্রস্তাবের কী হবে?

বাংলাদেশের আদালতে আদিলুরের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অথচ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের এক যৌথ প্রস্তাবে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতিতে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে অধিকারের বিষয়ে সাতটি বিষয় উল্লেখ করা হয়। আইনজীবীরা বলছেন, মানবাধিকারের কথা বলে অধিকার সংগঠনটি দেশকে অস্থিতিশীল করতে মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলো। সেটাও মানবাধিকারপরিপন্থী। তাই ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রস্তুাব গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

২০১৩ সালে তথ্য প্রযুক্তি আইনে ঢাকার মতিঝিলে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে অভিযান নিয়ে তথ্য বিকৃতির অভিযোগে দায়ের করা মামলায় বৃহস্পতিবার মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের সম্পাদক আদিলুর রহমান খান শুভ্র এবং পরিচালক এ এস এম নাসির উদ্দিন এলানের দুই বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এ এম জুলফিকার হায়াতের আদালত এ রায় ঘোষণা করেন। এ সময় আদালত প্রাঙ্গণে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা দূতাবাসের প্রতিনিধিরা পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

একইদিনে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রস্তাবে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চর্চার বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসরণের আহ্বান জানানো হয়। সেখানে মানবাধিকার সংস্থা ’অধিকার’ বাংলাদেশে একটি এনজিও যার নিবন্ধন বাতিলসহ এক দশকেরও বেশি হয়রানির শিকার হয়ে আসছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের সময় মানবাধিকার রক্ষার কথা বলে কিন্তু সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো সরকারের দ্বারা হয়রানি ও নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ওই প্রস্তাবে মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অবিলম্বে নিঃশর্তভাবে

প্রত্যাহার এবং সংগঠনটির নিবন্ধন পুনরায় চালু করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে বাংলাদেশের আদালতে অধিকারের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এখন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রস্তাব কতটা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত সে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মানবাধিকারের কথা বলে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট যে প্রস্তুাব দিয়েছে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলে মন্তব্য করেন আইনজীবী রানাদাশগুপ্ত। তিনি বলেন, মানবাধিকারের কথা বলে অধিকার সংগঠনটি দেশকে অস্থিতিশীল করতে পারে এমন মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলো। সেটাও মানবাধিকারপরিপন্থী।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে ৫ মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজত ইসলাম সমাবেশ করে। পরে সমাবেশস্থলে রাত্রিযাপনের ঘোষণা দেন সংগঠনের নেতারা। তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিতে যৌথ অভিযান চালায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ওই অভিযানে ৬১ জন নিহত হয় বলে দাবি করেছিল অধিকার। তবে সরকারের ভাষ্য, সেই রাতের অভিযানে কেউ মারা যায়নি। পরবর্তীতে ৬১ জন নিহতের তালিকার সত্যতা পাওয়া যায়নি।

তদন্ত শেষে ওই বছরের ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকার আদালতে আদিলুর ও এলানের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। এতে ৩২ জনকে সাক্ষী করা হয়। ওই বছরের ১১ সেপ্টেম্বর মামলাটি বিচারের জন্য অভিযোগ আমলে নেন ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনাল। এরপর ২০১৪ সালে দুই আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, আসামি আদিলুর ও এলান ৬১ জনের মৃত্যুর ‘বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মিথ্যা’ তথ্য দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি ও প্রচার করে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নের অপচেষ্টা চালায়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সরকার ও রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি দেশে-বিদেশে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করে।